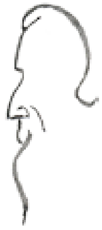

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা

- স্বামী মেধসানন্দ

রবীন্দ্রনাথ এক অতলান্ত গভীরতা

রবীন্দ্রনাথ আশি বছরের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন। সে জীবনের একদিকে যেমন অপার বিস্তার , অন্যদিকে অতলান্ত গভীরতা । সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বর্ণালী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সে জীবন আবার বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারে পূর্ণ । ব্যক্তিজীবন, জাতির জীবনের খুব কম দিকই ছিল যা তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠি ছুঁয়ে যায় নি। এমন সর্বতোমুখী, কালজয়ী প্রতিভা সর্বদেশে, সর্বকালে বিরল । এ হেন রবীন্দ্রনাথের অবদান তা সে যে ক্ষেত্রেই হোক তার ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করা অতীব কঠিন। যে উৎস থেকে সেই প্রতিভার প্রবাহ উৎসারিত এবং যে বিভিন্ন ধারায় তা প্রবাহিত , সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে সে মূল্যায়ন সম্ভব নয় - ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য আর একজনই কেবল রবীন্দ্রনাথের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন -- যেমন, বিবেকানন্দও নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "আর একজন বিবেকানন্দই বুঝতে পারবে এ বিবেকানন্দ কি করে গেল !" এ হেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার ব্যাপারে নিজের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতার কথা সম্পূর্ণ মনে রেখে "অঞ্জলির" সম্পাদকের অনুরোধে তাঁর জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে দু-চার কথা লেখা যেতে পারে।

আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি

যদি প্রশ্ন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিভূমি কি ছিল, তার নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর সনাতন ধর্ম, যা হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত, তার সুপ্রাচীন শাস্ত্র উপনিষদ। তাঁর নিজের কথায়, "আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে ।" কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তা ঘটেছিল এখন তা আলোচনা করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে হিন্দুসমাজের একটি অংশ রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাবে আদর্শে, চিন্তায়, কর্মে ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ বলে একটা আলাদা সমাজ হিসেবে পরিচিত ও পরিগণিত হতে থাকলো । কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দীর্ঘকালীন হিন্দুসংস্কার, চারিপাশে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব, হিন্দুদের সঙ্গে দৈনন্দিন আদান-প্রদান -এ সমস্তর ফলস্বরূপ ব্রাহ্ম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে সংশয় ও আপাতবিরোধিতার অভাব ছিল না । এতদসত্ত্বেও এটি ঘটনা যে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণাম -- যার অনেক কিছুই ইতিবাচক দিক ছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

একদিকে সনাতনপন্থী, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার নিগড়ে বদ্ধ , শ্লথ ভারতীয় সমাজের মধ্যে যখন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়লো, তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার একটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ। দ্বিতীয়টি, প্রাচীন যা কিছু তা যে উত্তম তাই প্রতিপাদন, এবং তৃতীয়টি হোল মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদ, যা প্রধানত পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, তার আলোকে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যা ইতিবাচক তাকে গ্রহণ করে , প্রয়োজন মত পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যা ভালো তাকেও আত্তীকরণ করার প্রচেষ্টা । ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ফলে সম্ভূত। কালক্রমে যখন ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হল তখন মূল সমাজটি "আদি ব্রাহ্মসমাজ" বলে পরিচিত হল। আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুশাস্ত্র উপনিষদকে নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। উপনিষদুক্ত নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানধারণা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় , সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রধান গুরুত্ব পেল । অন্যদিকে তারা হিন্দুদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রতিমাপূজা, অবতারবাদ, গুরুবাদ বর্জন করলো যদিও এ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ। হিন্দুসমাজও বলাবাহুল্য ব্রাহ্মদের ভিন্ন আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠান ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলে সেই সময় হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে পারস্পরিক নিন্দা-সমালোচনার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল।

উত্তরাধিকার

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রধান অনুসারী এবং পরবর্তীকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ব্রাহ্ম পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। সেই সূত্রে তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই তাঁর প্রথম জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল উপনিষদ ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা -- যা সরাসরি তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের অনেক সন্তানের মধ্যে একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের উপর সম্ভবতঃ সেই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী গভীর ও ক্রিয়াশীল ছিল।

Self schooled

প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Matthew Arnold, Shakespeare সম্বন্ধে লিখিত একটি সনেটে মন্তব্য করেছিলেন যে Shakespeare হলেন self schooled। রবীন্দ্রনাথও আক্ষরিক অর্থে তাই ছিলেন। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা খুব কম গ্রহণ করলেও তাঁর রচনাবলী পাঠে বোঝা যায় কি বিপুল ছিল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার। পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নিজস্ব জ্ঞানচর্চা । পুস্তক, প্রকৃতি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছিল তাঁর জ্ঞানচর্চার অন্যতম অঙ্গ। সেই জ্ঞান তাঁর মননশীল, সৃষ্টিশীল প্রতিভার জারক রসে রসায়িত হয়েছে, সৃষ্টি করেছে তাঁর অসাধারণ রচনাবলী। সেই রচনাবলীকে

যা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা হল তাঁর জীবনদর্শন। সেই জীবনদর্শন যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তা হল ঔপনিষদিক আধ্যাত্মিকতা। তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত সকলেই জানেন সেগুলির মধ্যে জীবনদেবতার কথা বারবার ফিরে এসেছে। সেই জীবনদেবতা এবং উপনিষদের ব্রহ্ম তথা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর অভিন্ন। সেই ব্রহ্মের "Anthropomorphic" রূপ নিরাকার, কিন্তু সগুণ ব্যক্তি ঈশ্বর (personal God) - অদ্বৈত বেদান্তীর নিরাকার, নির্গুণ, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম নন। কারণ নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম নিয়ে সাধনা করা চলে, কিন্তু কবিতা লেখা চলে না। শুধু কবিতা নয় যে কোন শিল্পসৃষ্টিতে দ্বৈতভাবনা, অর্থাৎ শিল্প, শিল্পের বিষয়বস্তু ও শিল্পী এ পার্থক্য থাকতেই হয়।

যে কোন মৌলিক সৃষ্টিশীল ও চিন্তাশীল মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো থেমে থাকেন নি। কি চিন্তায়, কি কর্মে, কি রচনায় তিনি নিজেকে কোন একটা অচলায়তনে বদ্ধ রাখেন নি। ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা "চরৈবেতি"র পক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন ও রচনা অনুধাবন করলে এ কথার যথার্থতা বোঝা যাবে।

অধ্যাত্ম চেতনার ক্রমবিবর্তন – প্রতিমা পূজার বিপক্ষে ও সপক্ষে

বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বলে আমরা এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিবর্তনের কথা আলোচনা করবো।

পিতা দেবেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে সেই সমাজের প্রচারিত ও অনুসৃত আদর্শের স্বপক্ষে একসময় যে সব বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন পরবর্তী যুগে তার অনেক কিছু থেকে তিনি সরে এসেছিলেন। একটি বিশেষ সম্প্রদায় চেতনা থেকে বিশ্বচেতনায় উত্তরণের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর দুই কালের বক্তব্যর তুলনামূলক আলোচনায়।

একসময়ে হিন্দুধর্মের প্রতিমা পূজার তীব্র সমালোচনা করে তিনি লিখেছিলেন, "মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা , যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে, বিশেষ জাতিকে, বিশেষ বিধিনিষেধ সকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে --- মূর্তিপূজা সেই সময়েরই যখন --- ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সঙ্কুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সঙ্কুচিত করিয়াছে -- ।"

কিন্তু একই বিষয়ে পরে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দুর্গাপূজার তাৎপর্য ও মহিমা সম্বন্ধে লিখলেন, "যেটাকে আমরা দূর থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটি কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক -অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। -- হৃদয়ের ভিতর দিয়ে কল্পনার ভিতর দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায় -- তাদের সীমা পাওয়া যায় না। -- এই কারণে বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে, ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি যদি মাটির পুতুল বলে দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়। --- "

আদি ব্রাহ্মসমাজের ধ্যানধারণা থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগে এতটাই সরে এসেছিলেন যে "সমাজের" তদানীন্তন কর্ণধাররা "সমাজের" সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার কথা বিবেচনা করছিলেন। এভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাঁর হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর বিশ্বভারতীর কল্পনা ও রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বিশ্বভারতীর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধর্মের নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী ছিলেন তেমনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, এমনকি বিদেশেরও কিছু কিছু মানুষ ছিলেন। এইভাবেই বিশ্বভারতীর আদর্শ "যত্র বিশ্ব ভবতি একনীড়ম্" বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক পরমপুরুষ তথা ব্রহ্মের কথা শুনে এসেছেন, সামাজিক ও পারিবারিক ব্রহ্ম উপাসনায় যোগ দিয়েছেন। সেই উপলক্ষ্যে তিনি উপনিষদের সুললিত মন্ত্র আবৃত্তি ও তার আলোচনা শোনার সুযোগ পেয়েছেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীতও গেয়েছেন।

ইতিমধ্যে উপনয়নের সময় পাওয়া গায়ত্রী মন্ত্রের আবৃত্তি ও তার অর্থধ্যান তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পরিপুষ্ট করে -- একথা নিজেই উল্লেখ করেছেন।

প্রভাতী উপাসনা

পরবর্তীকালে তিনি উপনিষদ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছেন -- মনন করেছেন। এর অনিবার্য্য ফলস্বরূপ তাঁর সত্ত্বার গভীরে ব্রহ্মভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই ব্রহ্ম তথা ঈশ্বরভাবনা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল আরও দুটি কারণে। প্রথমতঃ ব্রাহ্ম সমাজের প্রথামত কেবলমাত্র যৌথ উপাসনায় তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, -- আবার পিতা দেবেন্দ্রনাথের মত সংসার থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন নি। কিন্তু প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্ম মুহূর্তে যখন সমস্ত প্রকৃতি শান্ত, স্তব্ধ, যখন সংসারের কলকোলাহল শুরু হয় নি সেই সময় তিনি উপাসনার আসন বিছাতেন। পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে, পরমাত্মার সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করার সেইটাই ছিল তাঁর বিশেষ ক্ষণ, তাঁর একান্ত নিজস্ব সময়। যামিনীর শেষ যামে উঠে সেই যে তিনি বিশ্ববীণার সঙ্গে নিজের জীবনবীণা বেঁধে নিতেন সেই বীণার সুরই ছিল তাঁর সারাদিনের ব্যস্ত জীবনচর্য্যার, তাঁর প্রতি মুহূর্তের চিন্তা, কর্ম, রচনার "টাইটেল মিউজিক" -- যদিও কখনও তা শ্রুত, কখনও অশ্রুত।

দুঃখের বরষা

আরও একটি কারণ যা তাঁর ঈশ্বর চেতনাকে গভীরতর করেছিল তা হল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে পাওয়া বহু দুঃখ-বেদনা। বাদ্যযন্ত্রের তার যত সুক্ষ্ম হয় সামান্য শব্দও তাতে অনুরণিত হয়। কবির হৃদয়, শিল্পীর হৃদয় -- যা অতীব কোমল, সুক্ষ্ম তার সংবেদনশীলতাও অনেক বেশী। প্রিয়জন বিয়োগ থেকে শুরু করে, তাঁর সাহিত্যরচনার মূঢ় সমলোচনা ইত্যাদি নানাবিধ বেদনা তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করতো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখলে সব কিছু হারানোর মুহূর্তেই মানুষ সব কিছু পায়। দুঃখই তো মানুষকে গভীর করে, তাকে পরমপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে দেয়।

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল,
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।

জীবনদেবতা

"সত্যম্ , জ্ঞানম্ , অনন্তম্" ব্রহ্মকে একেবারে আপন করে নেওয়া, তাকে হৃদয়ের দেবতারূপে দেখা, ব্রহ্মের প্রতি সেই নিবিড় প্রেম পোষণ করার প্রক্রিয়া আরও বিশেষভাবে শুরু হল সম্ভবত তখন থেকে যখন তিনি আধ্যাত্মিক রসে ভরপুর নৈবেদ্য, গীতালি, গীতাঞ্জলির এক একটি কবিতা, পূজা পর্যায়ের এক একটি গান রচনা করতে থাকলেন। কবিতা ও সঙ্গীত এমন একটি মাধ্যম যেখানে শব্দের স্বল্প পরিসরে ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, হৃদয়ের চরম আর্তি ও আত্মনিবেদন সম্ভব। বিশেষতঃ পূজা পর্যায়ের সঙ্গীতরচনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো। এই ঈশ্বরই তাঁর কাছে "জীবন দেবতা" রূপে ধরা দিলেন -- যে জীবনদেবতা তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত -- তাঁর জীবনতরণীর কর্ণধার।

"ত্রিবেণী সঙ্গম"

শান্তিনিকেতনের উপাসনা সভায় যে আধ্যাত্মিক ভাবকে তিনি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন কখনও উপনিষদ, কখনও গীতা, কখনও বা বুদ্ধদেব বা যীশুখ্রীষ্টের বাণী উদ্ধৃত করে তাকে অনেক সংহত, অনেক গভীর, অনেক মনোহর রূপে পাই তাঁর কোন কোন কবিতায়। তাকেই আরও নিবিড়, নিটোল রূপে, আরও হৃদয়গ্রাহী রূপে পাই যখন সেই ভাব গীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভাব-বাণী-সুরের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে মনে হয় একটা কিছু পরম পাওয়া হল। যথার্থ ভাবগ্রাহীরা সেইসব গানগুলিকে শুধু একটা সাময়িক ভাল লাগা, বা তাকে সাময়িক সান্ত্বনা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে দেখেন না। বরং তার মধ্যে একটা অনন্ত সত্তা, অতলস্পর্শ শান্তি যাকে রবীন্দ্রনাথ শান্তির পারাবার বলেছেন , তার সন্ধান পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন।

রবীন্দ্রচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য -তাঁর গভীর ঈশ্বর প্রেম সম্বন্ধে অনবহিত থাকলে রবীন্দ্ররচনার মূলধারা সম্বন্ধে ধারণা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাঁর রচনাবলীতে সাময়িক আনন্দের আয়োজনের অভাব না থাকলেও তাঁর যে বৈশিষ্ট্যের জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথ, যা পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যবোদ্ধাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর সাহিত্যে চিরন্তন সত্যের , নিরন্তর আনন্দের -- যার আরেক নাম ঈশ্বর -- তাঁর নিবিড় উপস্থিতি।

রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক, না আধ্যাত্মিক ?

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক অর্থে ধার্মিক পুরুষ - যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন , মন্দিরে যান, বিভিন্ন পূজা-অর্চায় অংশগ্রহণ করেন, দেবতাকে ভোগ নিবেদন করেন, নিজের আর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেন -- ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন এক উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক পুরুষ। ধর্মের বহিরঙ্গ হল আচার-অনুষ্ঠান আর অন্তরঙ্গ দিক হল আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা এমন একটা বোধ যার দ্বারা ঈশ্বর, বিশ্বপ্রকৃতি, সকল মানুষ এবং নিজের মধ্যে এক অখণ্ড সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা যায়। সবার মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সবাইকে আবিষ্কার করা আধ্যাত্মিকতার মূল কথা। এর দ্বারাই আমাদের গতানুগতিক জীবন থেকে এই মহৎ জীবনে উত্তরণ ঘটে। "শান্তিনিকেতন" এবং "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থ দুটিতে -- যা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার দলিলস্বরূপ - তাদের পাতায় পাতায় আধ্যাত্মিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এখানে তিনি পরমেশ্বরের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, মানুষের স্বরূপ, চেতনার কোন ভূমিতে তাদের মিলন ঘটে, সেই মিলনের স্বরূপ ও ফল, দৈনন্দিন কোন সাধনার দ্বারা সেই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার প্রতিবন্ধকই বা কি প্রধানতঃ উপনিষদ থেকে বহু উদ্ধৃতি সহযোগে তা আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, ভারতের অন্য ভাষার সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ একজন অনন্য পুরুষ যাঁর প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক হলেও ধর্মীয় আচার্য্যের ভূমিকাতেও যাঁকে আমরা দেখি, এবং তাঁর ক্ষেত্রে সেই ভূমিকাগ্রহণ এতই স্বাভাবিক ছিল যে এ নিয়ে প্রশ্নও ওঠে না -- বিশেষতঃ যখন আমরা জানি তাঁর জীবনের ভিত্তিভূমি ছিল আধ্যাত্মিকতা।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্

তাঁর উপাসনা সভায় উপনিষদ থেকে সেই সমস্ত শ্লোক যা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল -- যার উদ্ধৃতি তিনি বারবার দিয়েছেন তাদের কয়েকটি মাত্র বাংলা অনুবাদ সহ নীচে উল্লেখ করা হল :

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যজেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্।"

জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে দেখবে, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে। আর কারও ধনে লোভ করবে না।

"ওঁ পিতা নোহসি।"

তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমম্ ,
সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্
সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

যে পরমব্যোম সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরমব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয়।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কশ্চন।"

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

"আমি খুঁজে বেড়াই তারে"

উপনিষদ তাঁর অধ্যাত্মচেতনার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকলেও উপনিষদভিন্ন হিন্দুদের অন্যান্য শাস্ত্র বিশেষ করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। বৈষ্ণবসাহিত্য ও বাউলদের জীবনদর্শন ও সঙ্গীতও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। উপনিষদুক্ত পরমসত্যের লোকায়ত প্রকাশ তিনি বাউলদের

জীবনচর্য্যায় ও গানে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় বাউল গানের একটি পংক্তি ছিল "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ" অথবা "আমি খুঁজে বেড়াই তারে / আমার মনের মানুষ যে রে --- "

আধ্যাত্মিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করে এরূপ সিদ্ধান্ত করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না, ব্রহ্ম উপলব্ধির বিভিন্ন পথ যথা জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ভক্তির মধ্যে ভক্তি তথা প্রেমের পথ বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের পথই ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পথ।

প্রেম ও জ্ঞান

তাঁর বেশ কিছু গান ও কবিতার প্রধান উপজীব্য ঈশ্বরপ্রেম। সেই প্রেমকে আশ্রয় করে আরও বহুবিধ ভাব এসেছে যথা, আত্মনিবেদন, শরণাগতি, প্রার্থনা, সীমার মধ্যে অসীম ও রূপের মধ্যে অরূপকে দেখা, সুখে-দুঃখে ও সম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, ঈশ্বরকে না পাওয়ার বা পেয়েও হারানোর বেদনা, ঈশ্বরানুভূতির নিবিড় আনন্দ, ভগবৎ সাধনার দুরূহতা, ভগবৎ করুণা, ঈশ্বরের সঙ্গে নানাবিধ সম্পর্ক। ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও প্রেমের পরিণতি এক হলেও পথ হিসেবে তাদের পার্থক্য তো আছেই। জ্ঞান মস্তিষ্ক-নির্ভর, কিন্তু প্রেম হৃদয়-নির্ভর। কবির মানসিকতা যেহেতু হৃদয়-নির্ভর -- কারণ কাব্যের উৎস মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় -- সেইজন্য কবির ঈশ্বর আরাধনার মার্গও হৃদয়-নির্ভর, তথা প্রেম।

যেমন আগে বলা হয়েছে ধর্ম আলোচক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে জ্ঞানমিশ্রা প্রেমের ভাব প্রবল। কিন্তু কবিতা বা সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের ভাবই প্রধান -- সেখানে জ্ঞানবিচারের এতটুকু কাঠিন্য নেই।

"দেবতারে প্রিয় করি"

তাঁর ঈশ্বরপ্রেম ছিল এমন একটি বৃত্ত যার কেন্দ্র ছিল সর্বত্র কিন্তু পরিধি ছিল না কোথায়ও। সেখানে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতির ভেদরেখা লুপ্ত। সেই বোধের অপরূপ কাব্যিক প্রকাশ "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।" সাধনার প্রথম স্তরে দেবতা ও প্রিয়জনের অবস্থান ভিন্ন; দেবতা শ্রদ্ধেয় কিন্তু প্রিয় নন; আবার ভালবাসার মানুষ প্রিয় কিন্তু তাতে দিব্য উপস্থিতির অভাব। সাধনার দ্বিতীয় স্তরে দেবতাকে প্রিয় করার সাধনা এবং প্রিয়র মধ্যে দেবতার উপস্থিতির অন্বেষণ। সাধনার চরমস্তরে দেবতা ও প্রিয়র ভেদরেখা অবলুপ্ত।

গান-কবিতার কুইজ

ভালোবাসার ভাষা এক তা সে মানবীয় প্রেম হোক বা ভগবৎ প্রেমই হোক। বিশেষতঃ মানবীর প্রেম ও ভগবৎ প্রেমের ভেদরেখা যখন সঙ্গীত বা কাব্যরচয়িতার মন থেকে মুছে যেতে থাকে তখন তাঁর রচিত কোন গান বা কোন কবিতা পূজা পর্য্যায়ের আর কোনটি প্রেম পর্য্যায়ের তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক এমনটিই ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের কোন গান, যেখানে প্রেম বা পূজার অনুষঙ্গ বিশেষ কোন শব্দ অনুপস্থিত -- প্রেম পর্য্যায়ের কি পূজা পর্য্যায়ের তা নিয়ে রীতিমত 'কুইজ' হতে পারে।

উদাহরণ দেওয়া যাক। "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা / এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।" স্বামী বিবেকানন্দ এই গানটি ভক্তিগীতি হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত "সঙ্গীত সংগ্রহ" বইটি যা ভক্তিগীতির সঙ্কলন, সেখানেও এটিকে ভক্তিগীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত বর্তমান লেখকেরও স্বভাবত ধারণা ছিল এটি "পূজা" পর্য্যায়ের গান এবং "অঞ্জলি"র পাঠকেরও অনেকের ধারণা সম্ভবত তাই। কিন্তু গীতবিতানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়লো এটি "প্রেম" পর্য্যায়ের। আবার "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ / ও মোর ভালবাসার ধন" এই গানটিকে লেখকের মনে হত "প্রেম পর্য্যায়ের", কিন্তু সেটি প্রকৃতপক্ষে "পূজা" পর্য্যায়েরও। এ ধরণের বিভাগ নিয়ে মনে প্রশ্ন উঠলেও আমাদের এখন তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশ্য ভক্ত বা প্রেমিকের কাছে এ ধরণের প্রশ্নের খুব একটা প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে মনে হয়; যেহেতু ভাষার থেকে তাদের কাছে ভাবই প্রধান; আর দু রকম ভাবই যখন এক ভাষায় প্রকাশ করা যায় -- ক্লাসিক রচনার যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা" গাইবার সময় যদি ভক্ত তার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বা বা শ্রীরামকৃষ্ণকে "জীবনের ধ্রুবতারা" রূপে কল্পনা করে নেয় বা প্রেমিক "তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ" গাইবার সময় প্রেমিকার প্রতি সেই ভাব আরোপ করে তাহলে পণ্ডিতদের আপত্তি হলেও ভক্ত বা প্রেমিকের তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি রবীন্দ্রনাথেরও তাতে আপত্তি হত বলে মনে হয় না - যদিও তাঁর গানের কিছু কিছু ব্যাপারে যেমন গায়ন পদ্ধতি, গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি তেমন স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ঈশ্বরের রূপকল্প

আগে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি ঈশ্বর-এ (Personal God) বিশ্বাসী হলেও তাঁর ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরের প্রতিমা সম্বন্ধে তাঁর প্রথম যুগের বিরুদ্ধ মনোভাব পরবর্তী কালে অনেকটা নমনীয় হয়ে এলেও তিনি কখনও তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু তাঁর পূজা পর্য্যায়ের গান যখন আমরা শুনি, যেমন "চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে" বা "ঐ আসন তলে মাটির পরে লুটিয়ে রব / তোমার চরণ ধূলায় ধূসর হব" কিম্বা "মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে" তখন যদি শুধু সুরে সন্তুষ্ট থাকি -- যেমন "ক্লাসিকাল" গানের ক্ষেত্রে, তাহলে তো কথা নেই। কিন্তু সুরের সঙ্গে যদি গানের অর্থও অনুধাবন করার চেষ্টা করি যা সঙ্গীত রচয়িতার অভিপ্রেত এবং ভজন গানের একটি আবশ্যিক শর্ত যেহেতু তা না হলে সে গানের পরিপূর্ণ রস উপলব্ধি করা যায় না, ফলে রচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, তখন মনের মধ্যে স্বতঃই এই সংশয় ওঠে ঈশ্বর যদি নিরাকারই হন তাহলে তাঁর "চরণ", "চরণধূলা", তাঁর "সাজ" কিভাবে সম্ভব ? ফলতঃ এইসব গান শোনার সময় আমাদের পূজ্য কোন দেব-দেবী বা মানুষের রূপ আমাদের মনে ভেসে ওঠে এবং তাতেই আমরা স্বচ্ছন্দ বোধ

করি। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের সাকার রূপে বিশ্বাস করেন না তাদের মনকে এ গানগুলি কি আপাতবিরোধিতার বোধে পীড়িত করে না বা তাঁদের মনে তখন কি "ইমেজ" ভেসে ওঠে ? কবিও যখন এ ধরণের কবিতা বা গান রচনা করেছিলেন তখন তাঁর চিত্তাকাশে কি রূপকল্প ফুটে উঠতো জানতে ইচ্ছা হয়।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি ?"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা, যেমন ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। "ধূলামন্দির" (দেবতা মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ ---) থেকে আরও অনেক কবিতায় যেমন "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়" বা তাঁর প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পাঠ করলে এমন ধারণা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অনুকুল ছিল না। কিন্তু একথাও তো সত্য যে মহাপুরুষ তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ছিলেন তিনি হলেন বুদ্ধদেব। যীশুখ্রীষ্টকেও তিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। অথচ এঁদের দুজনেরই জীবনের মূলভিত্তি ছিল ত্যাগ-বৈরাগ্য এবং তাই ছিল তাঁদের প্রচারিত আদর্শও। তাহলে এও কি একধরণের আপাতবিরোধিতা ? না, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই ধরণের সন্ন্যাসকে সমালোচনা করেছেন যার পরিণাম তাঁর ভাষায় "নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায়"। কিন্তু যে ত্যাগ "নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্যই" , যেখানে "আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহঙ্কারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য" সে ত্যাগকে তিনি শ্রদ্ধার উচ্চাসন দিয়েছেন। তাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত কর্মযোগকে তিনি সমূহ প্রশংসা করেছেন।

"চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর"

হৃদয়হীন শুষ্ক আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেও রবীন্দ্রনাথ যেমন মেনে নিতে পারেন নি তেমনি হৃদয়বৃত্তির সাময়িক উদ্বেলতা তথা ভাবোচ্ছ্বাসকেও তিনি সমর্থন জানান নি। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে, লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির যে পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল তা হল ভাব বা ব্যবহার হবে সংযত, মার্জিত, পরিশীলিত। রবীন্দ্রনাথ শুধু সে ধারা অনুসরণ করেন নি, তার ব্যক্তিপ্রকৃতি ও যুক্তিও তার পক্ষে ছিল। তিনি লিখেছেন –

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল ফেন ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ ।।
--- সম্বরিয়া ভাব অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর ।।"

অথচ এও ঠিক মধ্যযুগের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের এবং এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তির উচ্ছ্বাস তো সর্বজনবিদিত। বাঁধভাঙ্গা ভক্তি তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা থেকেই বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর একটি সুবিখ্যাত স্কেচের বিষয়বস্তু "ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দাম" নৃত্য আর তার ক্যাপশান "শান্তিপুর ডুবু ডুবু , নদে ভেসে যায়"। শ্রীরামকৃষ্ণের এমন বক্তব্য পাই যেখানে তিনি বলছেন, "যেখানে উর্জিতা ভক্তি -- ভক্ত ভাবে হাসে নাচে গায় সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং বর্তমান।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভক্তির আতিশয্য নিয়ে সমালোচনা অন্ততঃ সেই ক্ষেত্রে যথার্থ মনে হয় যেখানে সেই আতিশয্যের কারণ প্রকৃত ভক্তি বা ভাব নয় -- তা নিছক ভাবাপ্লুতা, আবেগ সর্বস্বতা যা যথার্থ আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী -- যার কঠোর সমালোচনা বিবেকানন্দও করেছেন।

"তোমার গর্ব ছাড়িব না"

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মচিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে অন্য প্রসঙ্গে যাবো। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দুটি ক্ষেত্রেই বাসনাকে সংযত করা - মনের যে অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি বৃত্তি আছে তাকে সংযত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সংযত করার উপায় প্রধানতঃ তিনটি। বাসনা বা বৃত্তিগুলিকে দমন (suppression) বা পূরণ (fulfillment) বা তাদের ঊর্দ্ধায়ন (sublimation)। বৃত্তিগুলিকে বিচারসহ যদি দমন করা যায় তাতে সুফল পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অবদমিত করলে বা জোর করে চাপা দিয়ে রাখলে পরে বিভিন্ন দৈহিক -মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বাসনার যথেচ্ছ পূরণ বা বৃত্তিগুলিকে ছেড়ে দিলে পরিবার বা সমাজজীবন ভেঙে পড়ে। কিন্তু বাসনা বা বৃত্তির ঊর্দ্ধায়ন বাসনা বা বৃত্তির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা ইতিবাচক পথ। বাসনা বা বৃত্তিগুলিকে ভগবন্মুখী করা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সেগুলিকে ভগবানের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। অহঙ্কার যদি করতেই হয় ভগবানকে নিয়ে অহঙ্কার করা। রবীন্দ্রনাথ কি চমৎকার করে এ ভাবটিকে প্রকাশ করেছেন যখন তিনি লিখেছেন --- "সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না"।

হে অনন্তপুণ্য

ধর্মীয় মহাপুরুষদের (আমরা যাঁদের অবতার বলি) মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও যীশুখ্রীষ্টকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন আগেই বলা হয়েছে। যদিও বুদ্ধদেব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, অথচ রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী, তবু বুদ্ধের মানবজীবনের মূল সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে "প্রাক্‌টিক্যাল" আলোচনা, তাঁর যুক্তিনিষ্ঠা, সর্বোপরি তাঁর মহাপ্রাণতা, সর্বজীবে দয়া এবং শান্ত, পুণ্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ উপলক্ষ্যে ওখানকার একজন আশ্রমিক যিনি দীর্ঘকাল ওখানকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরে ওখানকার "নিপ্পন ভবন"এর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন এবং জাপান ভ্রমণে এসেছিলেন সেই মাননীয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সৌমেনদা নামে অধিক পরিচিত) সঙ্গে তাঁর বাড়িতে বর্তমান লেখকের সাক্ষাত হয়। সৌমেনদা ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। সৌমেনদা-র বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের একটি ফটো দেখতে পাই -- যা আগে দেখিনি। সেই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের মুখে এমন একটি আর্তি প্রকাশ পাচ্ছিল

যা একেবারে বিরলদৃষ্ট । কৌতূহলী হয়ে সৌমেনদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে ছবিটি তোলা হয়েছিল যখন তিনি বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলেন । ভক্তেরা যে গভীর আকুতি নিয়ে, আত্মনিবেদনের ভাব নিয়ে মন্দিরে ইষ্টদেবতাকে দর্শন করে বাইরের মানুষ, পরিবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঠিক সেই ভাবটি দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম । সাধারণতঃ যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা বহু ফটোতেই দেখি তার থেকে এ এক ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ । সেই ছবিটি রামকৃষ্ণ মিশনে বাংলা মাসিক পত্রিকা উদ্বোধনে সম্প্রতি ছাপা হয়েছে যা এখানে পুনর্মুদ্রিত করা হল ।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন উল্লেখ আছে কি না বর্তমান লেখকের তা অনুসন্ধান করার সুযোগ হয়নি । কিন্তু এ যুগের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আদর্শের প্রধান ধারক ও প্রচারক বিবেকানন্দ -- যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ছিলেন এবং যাঁদের তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমবেশী জানতেন -- তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কি মনোভাব ছিল এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । বিষয়টি কিছুটা বিতর্কমূলক যা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বা পুস্তকের বিষয়বস্তু হতে পারে ।

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার"

কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য ও ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ সুনিশ্চিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন -- তবে দক্ষিনেশ্বরে নয়, কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের কোন একটি উপাসনা সভায় -- একথা শ্রীম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লেখিত আছে । শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব যে ক্রমশঃই প্রসারিত হচ্ছিল, তাঁকে আরাধ্য দেবতা রূপে অনেকে গ্রহণ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন । তার স্বীকৃতি তাঁর লিখিত মালঞ্চ উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে অসুস্থ নায়িকা নীরজা দেওয়ালে প্রলম্বিত শ্রীরামকৃষ্ণর ছবিকে উদ্দেশ্য করে বলছে ---

"বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে । আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা-অর্চনা সব গেল আমার ।"

১৯৩৬ সালে শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি দেশে মহাধুমধামের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয় । এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ছন্দে গ্রথিত যে অমূল্য বাণী দেন তা হল :

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি ।

কিন্তু শুধু বাণী দেওয়া নয়, আরও প্রত্যক্ষভাবে তিনি ঐ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন । সে কাহিনীর যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তেমনি তা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক এবং নাটকীয় মুহূর্তে পূর্ণ । কাহিনীটি আমরা জানতে পারি রামকৃষ্ণ মিশনের অধুনাপ্রয়াত সন্ন্যাসী পূজনীয় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী -- যিনি দক্ষ সংগঠক হিসেবে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সুপরিচিত ছিলেন এবং যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ এই ত্রয়ীর যথাক্রমে ১৯৩৬, ১৯৫৪ এবং ১৯৬৩ সালে জন্মশতবর্ষ পালন উৎসবের সম্পাদক তথা মুখ্য সংগঠকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন -- তাঁরই দেওয়া বিবরণ থেকে । মূল বিবরণটি ছিল ইংরাজীতে । আমরা তার নির্বাচিত অংশ এখানে বাংলা অনুবাদে তুলে ধরছি । তাঁর স্বমুখে এবার সে কাহিনীটি শোনা যাক্ ।

ধর্ম সম্মেলনে যোগদান – শর্ত, আরও কিছু শর্ত

এক বৎসর ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন । তা চলে ১৯৩৭ সালের ১লা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত । দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তাতে অংশগ্রহণ করেন । এই ধর্মসম্মেলনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ কিন্তু সহজে সম্ভব হয় নি ।

সবশুদ্ধ ধর্মসম্মেলনের যে ১৪টি অধিবেশন হয়, তার অন্ততঃ একটিতে সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ নিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলাম । সব শুনে তিনি বললেন, "স্বামীজী, আমার অভিজ্ঞতা হল আমি কোন সভায় যখনই বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, তা সে যেখানেই হোক, শুধু বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোল দেখেছি । এমনকি পরস্পরে মারামারি ও রক্তপাতের ঘটনাও বিরল নয় । আপনি কি চান আপনাদের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি আর একবার এ ধরণের ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়ি ?"

আমি বললাম, "আমি আপনাকে কথা দিতে পারি যে আমাদের অনুষ্ঠানে ঐরকম কিছু হবে না ।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সভা কোথায় হবে ?"

উত্তর দিলাম, "কলকাতার টাউন হলে ।"(চিৎপুর রোড)

তিনি বললেন, "আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, কারণ সেখানে অনেকটা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে । আমি এখন

তা পেরে উঠব না।" (রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স ৭৬, মাঝে মাঝে অসুস্থও হয়ে পড়ছিলেন।)

আমি বললাম, "কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হল-এ (কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে) যদি হয় ? তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবে না। আপনি তাহলে রাজী হবেন তো ?"

রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত তাতে রাজী হলেন। স্থির হল তিনি ধর্মসম্মেলনের ৩রা মার্চের অপরাহ্নের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন।

এই সাক্ষাতের কিছুকাল পরে যখন সভার প্রস্তুতি চলছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতিত্ব করার আরও কিছু বাড়তি শর্ত দিলেন। তিনি জানালেন, যেহেতু তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না তিনি তাঁর বক্তব্য বলার পরই সভা ছেড়ে চলে আসবেন। তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল, তিনি চলে আসার পর কে তখন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ?

ফলে তখন আর একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, যিনি রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন, খোঁজ করার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ সে ব্যক্তি উপযুক্ত না হলে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হতে রাজী হবেন না।

এরপর রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে বড়জোর ১৫০০ থেকে ১৬০০ শ্রোতা বসতে পারে। কিন্তু এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে যে কয়েক হাজার লোক হলে ঢুকতে চাইবে। তখন কি করবেন ? শেষপর্যন্ত ঢুকতে না পেরে তারা হট্টগোল শুরু করবে এবং নানারকম গণ্ডগোল পাকাবে। ফলে আপনাদের সভা শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে যাবে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি তখন এই বলে আশ্বস্ত করলাম, "দেখবেন, এরকম অবাঞ্ছিত কিছু হবে না। কারণ আমরা হলের বাইরে কলেজ স্কোয়ার পার্কে যে পাম গাছগুলি আছে তাতে অনেক লাউডস্পীকার লাগিয়ে দিয়েছি। যদি ঐ পার্কে পঁচিশ হাজার লোকও জড়ো হয় তাহলেও তারা ধর্মসম্মেলনের সমস্ত বক্তৃতাই ভালভাবে শুনতে পাবে।"

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "স্বামীজী, আপনারা দেখছি খুব সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। এখন আমি নিশ্চিন্ত হলুম সব কিছু নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।"

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের বদ্‌লী সভাপতি হিসাবে আমি যাঁকে স্থির করলাম তিনি হলেন "Modern Review" (এবং "প্রবাসী" পত্রিকারও) পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আমি রামানন্দ বাবুকে সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে অনুরোধ করলাম যে রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে তাঁকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, "রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করব ! এর থেকে বড় সম্মান আর কি হতে পারে ! আমি এ প্রস্তাবে খুবই খুশী।" এ সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথও বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

৩রা মার্চ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভা আরম্ভ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে নিয়ে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ আমার নজরে এল হলে দুজন দর্শকের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে গেছে -- এমনকি একজন চেয়ার তুলছে আর একজনকে মারবে বলে। আমি ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনমতে তাদের আলাদা করে দিলাম। তারপর তাদের একজনকে আর একজনের থেকে অনেক দূরে বসিয়ে দিলাম।

একটি অসাধারণ ভাষণ

রবীন্দ্রনাথ যখন হলে ঢুকলেন তখন হল সম্পূর্ণ শান্ত ও নিস্তব্ধ। অন্যান্য বক্তারা এবং আমরা সংগঠকরা মঞ্চের উপর চেয়ারে বসলাম। কেবল রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি আরামদায়ক চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বিখ্যাত যেমন সরোজিনী নাইডু, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যান্ড (সে সময়ের একজন প্রখ্যাত বৃটিশ রাজপুরুষ এবং মনস্বী ও যশস্বী লেখক)। আমি মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম তিনি কোন অসুবিধা বোধ করছেন কি না।

বলাবাহুল্য প্রধানতঃ যাঁর আকর্ষণে অধিকাংশ দর্শক এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ -- যাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেক ভারতবাসী গর্বিত। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। অপূর্ব সেই ভাষণটি পাঠ করতে আধ ঘন্টার মত সময় লাগল। সূঁচ পড়লেও শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে দেড় হাজার শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে সেই বক্তৃতা শুনলেন।

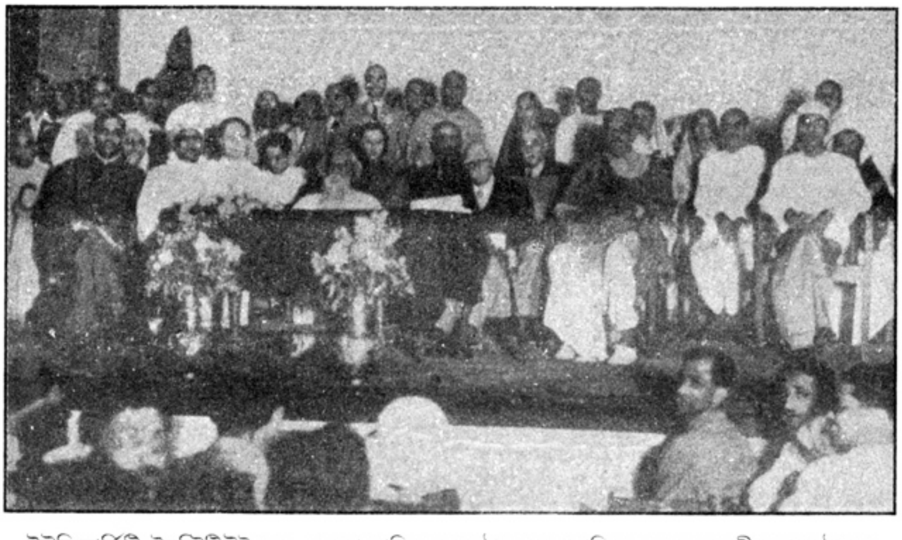

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বক্তৃতার শেষে চলে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চেয়ারেই বসে থাকলেন। এদিকে সভাও চলতে লাগল। আমার কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব অস্বস্তি হতে থাকল এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি সভার শেষপর্যন্ত থেকে যান তাহলে তাঁর বদ্‌লী সভাপতি হিসেবে ঠিক করা রামানন্দবাবুকে কি জবাবদিহি করব। তাই আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকলাম যে রবীন্দ্রনাথ সভা শেষ হওয়ার অন্ততঃ কয়েক মিনিট আগেও যেন চলে যান। তাহলে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও রামানন্দবাবুকে সভাপতির আসনে বসানো যাবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনা তা ঘটলো না। যখনই আমি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন কি না, তিনি

উত্তর দেন, "না, না স্বামীজী, আমি ভালই বোধ করছি -- আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমার সব কিছু খুব ভাল লাগছে।"

তাঁর ভাষণের পর আরও তিন ঘন্টা সভা চললো। সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথ বসে থাকলেন এবং সব বক্তৃতাই শুনলেন। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যান্ড ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠে বললেন, "এই ধর্ম মহাসভা সাতদিনের বদলে যদি শুধু আজকের দিনের জন্যও হতো তাহলেও বলা যেত তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং সে সফলতার কারণ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ভাষণ।"

সভার শেষে রবীন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার পর রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমি কথা বললাম এবং তাঁকে ধর্মসম্মেলনের অন্য একদিনের অধিবেশনের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি অনুগ্রহ করে রাজী হওয়ায় আমার এক বড় দুশ্চিন্তা দূর হল।

সভায় রবীন্দ্রনাথের যোগদানের পরের দিন অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ রামানন্দবাবু এবং আমি দুজনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম খোঁজ নেওয়ার জন্য যে আগের দিনের অতখানি ধকলের পর তাঁর শরীর কেমন আছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, "আমি ভালই আছি। স্বামীজী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এত দর্শকের উপস্থিতি সত্ত্বেও এরকম শান্তিপূর্ণ সভার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম। আমি বাস্তবিকই এই সভা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠন ক্ষমতায় সত্যিই আমি অভিভূত। আপনারা সত্যিই একটা বড় কাজ করেছেন।"

আমি অবশ্য বিশ্বাস করি রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সাফল্য আমাদের প্রচেষ্টায় হয় নি -- রামকৃষ্ণদেবের কৃপাতেই তা সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও আমরা

সাধারণতঃ কোন বিষয় আলোচনার একাধিক উদ্দেশ্যের মধ্যে দুটি মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে। এক হচ্ছে সেই বিষয়টি জানা, আর একটি আমাদের জীবনে সে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। প্রথম উদ্দেশ্যর কথা মনে রেখে কিছুটা আলোচনার পর এরপর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু বলা যাক। তার আগে একটু ভূমিকা।

আমরা বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি -- কিছু না কিছু তাঁর চর্চাও করে থাকি। কিন্তু সে চর্চা বা ভালোবাসার গভীরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ভালোবাসা বা চর্চার গভীরতা যথেষ্ট কম, কারণ তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নৃত্যতেই সীমিত , যার আবেদন প্রধানতঃ আমাদের ভাবাবেগের কাছে। আর যে কোন ভাবাবেগই , যার কোন দৃঢ় ভিত্তি থাকে না, যা কোন গভীর উৎস থেকে উৎসারিত হয় না -- তার প্রভাব হয় সাময়িক।

"মহতী বিনষ্টি"

প্রধানতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রনৃত্যতেই সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হল, রাজাধিরাজ যাঁর ভাণ্ডারে বিবিধ মূল্যবান রতন আছে যার সামান্য কিছু পেলেও সারা জীবনের অভাব মিটে যাবে এবং যা তিনি অকাতরে দিতেও চাইছেন আমরা তা না নিয়ে সাময়িক আনন্দের জন্য তাঁর কাছে সামান্য অর্থভিক্ষা করছি। রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে আমাদের জীবনের পাত্রকে পূর্ণ করে দেওয়ার মত বস্তু যথেষ্ট থাকলেও আমরা তা কি নিতে চাই ? অথচ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ এবং বাংলা আমাদের মাতৃভাষা হওয়ার সুবাদে আমরা না জানি কত সহজেই তা পেতে পারতাম। এর থেকে "মহতী বিনষ্টি" আর কি হতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্।

আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি অন্যতম সাধনা ছিল "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।" কিন্তু আমাদের জীবনে সে সাধনার কোন অঙ্গীকার না থাকাতে, কোন প্রতিফলন না থাকাতে দেবতা আমাদের থেকে দূরেই থাকেন -- দেবতার দিব্য স্পর্শে আমরা সঞ্জীবিত হই না, উর্দ্ধায়িত হই না -- যা ভূমা তা আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। অন্যদিকে প্রিয়রে দেবতা করি না বলে, প্রিয়র মধ্যে যে দিব্য সত্ত্বা আছে তার কোন সন্ধান করি না বলে প্রিয়কে ভালোবাসা আমাদের আসক্তির জালে বদ্ধ করে, মুক্তির আনন্দ পাই না, তা আমাদের অনন্ত সত্ত্বাকে সঙ্কুচিত করে রাখে প্রসারিত হতে দেয় না; শুধু তাই নয়, কালক্রমে প্রিয়র প্রতি সেই প্রেম শীর্ণ শুষ্ক হয়ে যায় -- এমনকি "পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে" তারও আশংকা থাকে।

যে অধ্যাত্ম ভিত্তিক জীবনদর্শন রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের তথা রবীন্দ্ররচনার মূল ভিত্তি, যে উৎস থেকে তা উৎসারিত, যে বোধে তা সঞ্জীবিত, যা তাঁকে "কবিমনীষী" করেছে, যা তাঁর জীবনকে সার্থক করেছে, তার সন্ধান করা, নিজের জীবনে কমবশী তাকে লাভ করে তাকে মহত্তর করা, পূর্ণতর করার প্রয়াসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থরূপে ভালোবাসা ও চর্চা করার সূত্র নিহিত।

"সমস্তই কেবল সংসারকে দেব, তাঁকে কিছুই দেব না !"

কি সেই জীবনদর্শন যার কথা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, কিভাবে সেই জীবনদর্শনকে আমরাও নিজেদের জীবনে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রয়োগ করে ঠিক ঠিক লাভবান হতে পারি সে সম্বন্ধে আমাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত হবে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান সেই উপদেশগুলির বক্তব্য গভীর অথচ প্রাঞ্জল -- ফলে নতুন করে তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

*আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম, দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনমতে দিন কেটে যাচ্ছে -- যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের অন্য কোন অর্থ নেই।

*একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও। তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে, তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা দিনে রাতে অবিশ্রাম এই আশ্চর্য্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবল বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না, অর্থ পাবে না।

*আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব, আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যেই একান্ত "না" করে রেখে দেব এ তো কোন মতেই হতে পারে না।

*এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি এত বড় বিশ্ব এবং এমন মহৎ মানব জীবনে তাঁকে কোন জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না -- এ তো কিছুতেই হতে পারে না।

*দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুনোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে "পিতা নোহসি"। তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্য তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। সেইটুকু সময়ে থাক তোমাদের কাজকর্ম, থাক তোমাদের আমোদপ্রমোদ।

*কিছু যদি নাই জোটে তবে এই অভ্যাসটুকু প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে দেবে। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্ততঃ সে দেওয়াটাও তাঁকে দেব।

*যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না। তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

*প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে, মনটিকে, হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকুল করে তুলতে হবে।

(মনকে আসক্তিমুক্ত করার সাধনা একটি প্রয়োজনীয় সাধনা -- তা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।) --- কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্য চেষ্টা করতে হয়। --- তাই আমি প্রতিদিন শেষরাতে উঠে চুপ করে বসে নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এক এক দিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্তু আবার কোন কোন দিন দেখি, ফস করে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই আমার ছোট্ট আমিটা ঐ দূরে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে, যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বল সেই মানুষটা। সেই লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে , ক্ষোভ আছে, আরো কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়। আমাকে ছোটখাট সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর শান্তির ব্যাঘাত কেউ করতে পারে না, আমি যেন নিজেকে সেই বিরাটের মধ্যে বিলীন দেখতে পাই। এটার জন্য কি কম চেষ্টা করতে হয় -- প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে তবে সহজ হয়ে আসে -- "। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা বলছেন, "একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে, স্বার্থের দিকে, আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে, প্রেমের দিকে, পরমাত্মার দিকে অপরিমাণ রূপে বাঁচতে হবে।"

শান্তি শান্তি শান্তি

কে বলতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীগুলির কোন একটির গভীর অনুধ্যান আমাদের হৃদয়ের দীর্ঘকালের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে পূর্ণতার সন্ধান দেবে না, যার পরিণতিতে আমরা বলে উঠব --

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল সমাপন
চপল চঞ্চল লহরী লীলা পারাবারে অবসান,
নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিত লোচনে চাই।
আর কোলাহল নাই।। ❑

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ –
* শান্তিনিকেতন -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* মানুষের ধর্ম -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* গীতবিতান -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* সঞ্চয়িতা -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* মালঞ্চ -- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
* Global Vedanta February 17, 2009
Published by Vedanta Society, Seattle
* এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও মন্তব্যের কয়েকটি এবং মুদ্রিত ফটো দুটি উদ্বোধন পত্রিকা (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মাসিক মুখপত্র), রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের ও উদ্বোধন পত্রিকার প্রকাশকের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।